দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা □ ড. এ.এইচ আহমেদ কামাল

বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র চর্চা ও শিক্ষা সংকট

১৯৯৩ সালে 'New York Times' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে Most violent campus in the world নামে আখ্যায়িত করেছিল; আমি তখন আমেরিকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত ছিলাম এবং এই ক্যাম্পাস সম্বন্ধে এ কথা কেন বলা হলো এর উত্তর আমার সহকর্মীদের কাছে অনেক দিন দিতে হয়েছে। সহকর্মীদের কাছে সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম আজকের আমার উত্তর এক হবে না। সেদিন আমি কখনো দেশের রাজনীতি, কখনো রাজনীতিবিদ, কখনো ছাত্র, কখনোবা অন্য শিক্ষকদের দোষারোপ করে বিদেশিদের কাছে আমার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছি। তাদের প্রশ্নের পুরো উত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

'৬২-এর কালাকানুনের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ প্রায় এক যুগ ব্যাপী এক ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই লড়াইয়ের প্রথম সারির শিক্ষকদের অনেককেই '৭১'র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। প্রতি ডিসেম্বরে আমরা তাঁদের আত্মদানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে তাঁদের আত্মত্যাগ দীর্ঘদিন আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা লাভের পর ৪৩ বছর পার হয়ে গেছে। যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা একদিন হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টার খতিয়ান দেবার দাবি ক্রমশ উচ্চকিত হচ্ছে।

'৭৩-এর অধ্যাদেশ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বিজয় সূচিত হয়েছিল সেই সুদীর্ঘ লড়াইয়ের; যে লড়াই ছিল গণতন্ত্রের জন্য, যে লড়াই ছিল শিক্ষাঙ্গনে স্বায়ত্তশাসনের জন্য। সেদিন আমাদের ধারণা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গণতন্ত্রায়ন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন এলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা বিকশিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে গণতন্ত্র চর্চার সূতিকাগার আর অবসান হবে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রগতিবিরোধী ষড়যন্ত্রের। সেদিন আরো ধারণা হয়েছিল যে, কেবল একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশই একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী হতে পারে। দুঃখের বিষয়, আজ আমরা একথা জোর গলায় বলতে পারি না যে, আমাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেন হয়নি, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আজ আমাদের কঠোর আত্মসমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে। যদি সে আত্মসমালোচনা সততার সাথে করা যায় তাহলে এখনও যে ভ্রান্তির জালে আমরা আটকা পড়ে আছি, তা থেকে মুক্তি সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

'৭৩-এর অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রশাসনে ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন হলো, কিন্তু সে গণতন্ত্রায়ন ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক 'কতগুলো নির্বাচনের সমাহার মাত্র'। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে আমরা ভুলে গেলাম যে, শুধু ভোট দিলেই গণতন্ত্রায়ন হয় না, গণতন্ত্রায়নের জন্য প্রয়োজন যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তা আমরা অচিরেই বিসর্জন দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবহেলিত হলো গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, তৈরি হলো না যুগোপযোগী কারিকুলাম, হলো না মেধার সঠিক মূল্যায়ন। অনিয়মের অভিযোগ এলো শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে-মেধা প্রায়শ হটে গেল দলীয় শক্তির দাপটে। এই প্রক্রিয়ায় সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার মান হলো নিম্নগামী, শিক্ষকের মর্যাদা হলো ভূলুণ্ঠিত। জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্র রাজনীতির অদূরদর্শী আঁতাতে শিক্ষাঙ্গন হলো সন্ত্রাসের আখড়া। কিছু শিক্ষকের জন্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তি হলো ব্যক্তিগত হীনস্বার্থ চরিতার্থতার কৌশল। নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাত্রা যে গতিতে বাড়লো সেই গতিতে হারিয়ে গেলো শিক্ষকদের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শুরু হলো রাজনৈতিক দলের বেপরোয়া লেজুড়বৃত্তি, রাজনৈতিক দলের কর্মীদের জন্য সৃষ্টি করতে হলো অন্যায় সুযোগ-সুবিধা। আর নিজেদের জন্য এই অন্যায় সুযোগ সুবিধার খেলায় অনেক শিক্ষকই পিছপা ছিলেন না। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় সহায়ক হলো '৭৩-এর অধ্যাদেশ। এই অধ্যাদেশে আমাদের জন্য সবই ছিল, ছিল না শুধু জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। কারণ, আমাদের তান্ত্রিক বোধের গভীরে বাসা বেঁধে রয়েছে নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বার্থপরতা। ত্রায়ন ও স্বায়ত্তশাসনের পরিমণ্ডলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে উৎসাহিত করতে পারতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নতুন নতুন প্রশ্ন উত্থাপনে, উৎসাহিত করতে পারতো সুদীর্ঘ পরাধীনতা প্রসূত হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, আমাদেরই দায়িত্বহীনতায় সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। আমরা নিশ্চিত যে, এই পরিস্থিতি দিনের পর দিন আমাদের অনেকেরই মানসিক শান্তি হরণ করে চলেছে। তবে একথা ঠিক যে, এর জন্য আমি না অন্য কেউ দায়ী; একথা বলে আজ আর পার পাওয়া যাবে না। এর দায় আমাদের সকলকেই নিতে হবে।

আজকে আমরা একটা ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছি, সে জগতের সমস্যা বুঝতে হলে সেই জগতটাকেই আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে

৬০-এর দশক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক।...ছাত্ররা লেখাপড়া করতো, আবার রাজনীতিও করতো। কারণ তারা জানতো, যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তারা আছে, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তারা বৈষম্যের শিকার হবে, তারা এর থেকে বেরুতে পারবে না, তাদের জীবন বিকশিত হবে না, সেই কারণে রাজনীতিও তাদের লেখাপড়া চর্চার একটি অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু আজকে কি হচ্ছে?

হবে। আমরা বলি বিশ্বায়ন, অর্থাৎ 'বাজার' এর প্রাধান্য; বাজারের এই প্রাধান্যের মানেটা কি? বাজারের প্রাধান্যের মানে হচ্ছে ক্রেতা, বিক্রেতা, ফড়িয়া আর দালাল-বাটপাড়দের আধিপত্য। অতএব, এই ধরনের একটি যুগে, এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে দুর্নীতি হবে না, যেখানে সন্ত্রাস হবে না; এটা চিন্তা করাই বাহুল্য মাত্র এবং তার সমাধান শিক্ষাঙ্গনে থাকবে, তার সমাধান শিক্ষাঙ্গনের বাইরে এককভাবে থাকবে, সেটা ভাবাটা এক ধরনের বোকামি। এ সমস্যাটা যেমন বিশ্বব্যাপী, এর সমাধান করতে গিয়েও আমাদেরকে সেই বিশ্বের সমস্যার সাথে আমার জাতীয় সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, সেই শিক্ষার সমস্যার মধ্যে আমার অস্তিত্বগত সমস্যা, এগুলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। আমরা কেন দুর্নীতিগ্রস্ত হই? কেন একজন দুর্নীতি করেনি বলে তাকে সবাই বোকা বলে? মানুষের এই মূল্যবোধ কিভাবে বদলে গেল—তার রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা যদি আমরা বুঝতে পারতাম, আলোচনা করতে পারতাম, তাহলে আমরা অনেক বেশি শিক্ষিত হতে পারতাম।

অনেকে মনে করেন, ৬০-এর দশক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পিছনে কারণটা কিন্তু আমরা আলোচনা করিনি। ৬০-এর দশকে ভালো ছেলেদের সামনে বিকশিত হওয়ার পথ খুব খোলা ছিল না, সেই কারণে ভালো ছাত্রদের রাজনীতিতে আসতে হতো। তারা লেখাপড়া করতো, আবার রাজনীতিও করতো। কারণ তারা জানতো, যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তারা আছে, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তারা বৈষম্যের শিকার হবে, তারা এর থেকে বেরুতে পারবে না, তাদের জীবন বিকশিত হবে না, সেই কারণে রাজনীতিও তাদের লেখাপড়া চর্চার একটি অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু আজকে কি হচ্ছে? আজকে বিকশিত হওয়ার জন্য আরোও একটি পথ খুলে গেছে। অর্থাৎ যারা লেখাপড়া করেন

ধনী কৃষক ও মধ্য কৃষকের সন্তানরা যারা ঢাকায় আসছে, চাকরি খুঁজছে, পড়াশুনা করছে, আত্মীয় খুঁজছে, নিদেনপক্ষে জেলার লোক খুঁজছে, তারা জেলাবাদ (আঞ্চলিক ইজম) করছে। তারা old association করছে, তারা পুরনো কলেজ association করছে যার মাধ্যমে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে, যে নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে তারা এই ফরমাল সেক্টরে ঢোকার চেষ্টা করছে। যাকে বলি 'মামা খোঁজা' এবং এই মামা খোঁজাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে সম্পন্ন করছে। শহরে জায়গা দখল করার জন্য জেলা, আত্মীয়তা এবং গ্রামের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তাকে ঢুকতে হচ্ছে। এই ঢোকার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দুর্নীতি বিকশিত হচ্ছে, কারণ এই ঢোকার মধ্য দিয়ে একটা লেনদেন (exchange) হচ্ছে, যার মাধ্যমে আমি ঢুকেছি তার জন্য আমি কি করবো, আর আমার জন্য সে কি করবে। এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক কর্মীও কিন্তু রিক্রুটেড হচ্ছে। Third world, First world, বরিশাল-মাদারীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 'world' তৈরি হচ্ছে। গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা কখনও কখনও জেলাভিত্তিক এই আঞ্চলিকতা। যা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আঞ্চলিকভাবে সংহতি তৈরির এই প্রক্রিয়া এখন অনেক বেড়ে গেছে। কারণ সমর্থক ও সহযোগীদের সংখ্যার ওপর রাষ্ট্রীয় সম্পদ হস্তগত করার সুযোগ বাড়ে এবং এই পথ দিয়ে উপরে ওঠার জায়গাটাও হয়ে যায়। আমরা এই পথ দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করি। অতএব, এই অর্থনীতির মধ্যে, এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই এমন একটি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে যেই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে বাধ্য এবং চলছেও। তাই আজকে এককভাবে শিক্ষাঙ্গনের কথা বলে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। পুরো সমাজ ব্যবস্থাটা বদলাতে হবে, পুরো সমাজ ব্যবস্থাটা কিভাবে বদলাবে,

তাদের বিকশিত হওয়ার পথে বাধা থাকলেও আরেকটি পথও তৈরি হয়েছে। সেটা হচ্ছে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ। যার মাধ্যমে সে আরেকটি পথে ওপরে উঠতে পারে। বর্তমানে অনেকেই এই পথে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ঢাকা শহরে, বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রাম থেকে দুই শ্রেণির মানুষ আসছে, যারা মধ্য এবং উচ্চ কৃষকের সন্তান। তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে শ্রেণি উত্তরণে ব্যস্ত রাখছে। এই শ্রেণি উত্তরণ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছে। আর গ্রামের ঐ দরিদ্র যারা নদী ভাঙনে বসতবাড়ি হারিয়ে, কাজ না পেয়ে এবং ধার-দেনায় জর্জরিত হয়েছে তারাও ঢাকা শহরে আসছে; নতুনভাবে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য।

কি করে নতুনভাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম হবে—এই প্রশ্নগুলো মোকাবেলা করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি বদল করতে বা এই প্রক্রিয়াটিকে পাল্টে দিতে যে উদ্যোগ প্রয়োজন সেটাই আজকের কর্মসূচি।

'৭২ থেকে '৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের পদোন্নতিকে কেন্দ্র করে সেদিন খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ তাঁর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সেদিন পদোন্নতি দেয়া হয়নি। প্রতিদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটছে, কেউ আলোচনাও করে না। সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। '৭২ থেকে '৭৫, এই তিন বছরে কোন অনিয়মের জন্য যে পরিমাণ উত্তেজনার সৃষ্টি হত, আজকে আমরা সেগুলো জানিও না, খোঁজও রাখি না, জানতেও চাই না, কেউ বললে শুনতেও চাই না, এইগুলো সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রক্রিয়াও দুর্নীতিগ্রস্ত আজকে। আমরা যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, অনেক সময় সেটা করি কারণ আমি আরেকটি অন্যায় করতে চাচ্ছি অথবা আমি ঐ অন্যায়ের সুবিধাটা ভোগ করতে পারছি না, সেই কারণেই আমি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। আজকে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেহারাটা তেমনি দাঁড়িয়ে গেছে। '৭৩ সালের অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র এসেছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বৈরাচারিতার অবসান ঘটেছিল, যে অধ্যাদেশ নিয়ে আমরা গর্ব করেছি, যে অধ্যাদেশের ভিত্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় করতে চেয়েছিলাম, আজ সেই অধ্যাদেশের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা তৈরি হয়ে আছে। কারণ আমরা সেটাকে ঠিক সেভাবেই ব্যবহার করছি। আমরা ধীরে ধীরে ঐ অধ্যাদেশকে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা যায় সেটা রপ্ত করে ফেলেছি। আজকে কোন শিক্ষককে যদি উপাচার্য নির্বাচিত হতে হয় তাহলে কি কি করতে হয়, সে তালিকা যদি আমি উল্লেখ করি, তাহলে পাঠক ঘাবড়ে যাবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও এসব করতে হয়। এই তালিকা যদি আমরা খোলা মনে আলোচনা করি তাহলেই একদিন সব বেরিয়ে আসবে। এই অবস্থা প্রমাণ করে যে একটা ভালো আইন থাকলেও দুর্নীতি বন্ধ হয় না, এটাই হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা। তাহলে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য আমরা কি করবো? আমাদের একটাই কাজ, প্রশ্ন করা, প্রতিবাদ করা, প্রতিরোধ করা। কিন্তু প্রতিরোধ তো প্রতিকার না, আমরা মনে করি প্রতিরোধ চিরন্তন হতে হবে।

আত্মগ্লানি আর আত্মশ্লাঘা কখনোই আত্মশক্তি অর্জনে সহায়ক হতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার পূর্ব গৌরবে ফিরিয়ে আনার জন্য পেছনে আর না তাকিয়ে এবার সামনে তাকানো যাক। আমরা একুশ শতকের আঙিনায় প্রবেশ করেছি। সারাবিশ্ব আজ তারই আয়োজনে মুখর। বিশ্ব-পরিসরে নতুন শতাব্দীতে কে কোথায় জায়গা করে নেবে সে চিন্তায় সবাই নিমগ্ন। আমরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের সদস্য, তাই দেশ ও জাতিকে একুশ শতকের জন্য তৈরি করার গুরুদায়িত্বের অনেকটা আমাদের কাঁধে। 'একুশ শতক' শুধু শতবর্ষব্যাপী সময়ের কোন সূচক নয়। একুশ শতক বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতির অসহনীয় দাপট, একুশ শতক জাতিরাষ্ট্রের অবলুপ্তির আয়োজন, একুশ শতক প্রযুক্তির আকাশ ছোঁয়া বিকাশ, একুশ শতক আমাদের ঐতিহ্য লালিত যা কিছু মহান ও সুন্দর, তার অনেক কিছুই বিশ্বকরণ প্রক্রিয়ার জোরে অবলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা। একমাত্র গভীর মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ ঘটিয়েই এ অবস্থার মোকাবিলা সম্ভব। আর তা সম্ভব হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চাকে আরো সৃষ্টিশীল করে।

সে দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদেরকে ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রসূত দলাদলি আর যথেচ্ছাচারিতার ঊর্ধ্বে অবস্থান নিতে হবে। সেটাকে সম্ভব করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়কে রঙ-বেরঙের দলাদলির ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। অগ্রাধিকার দিতে হবে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াকে, শিক্ষাকে করতে হবে যুগোপযোগী। সর্বোপরি বর্জন করতে হবে গণতন্ত্র আর স্বায়ত্তশাসনের নামে সকল প্রকার স্বার্থান্বেষী ও দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড।

● লেখক : অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়